1

ভাববাদী রাষ্ট্রীয় মতবাদ

অবতারণা

রাষ্ট্র সম্পর্কে ভাববাদ বা চরম কর্তৃত্ববাদী মতবাদ দার্শনিক ভাববাদের মহান ঐতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডের রাষ্ট্রচিন্তায় এই মতবাদের প্রভাব ছিল প্রবল। জার্মান দার্শনিক হেগেল সর্বপ্রথম মতবাদটিকে তার বিশিষ্ট রূপ দেন। টি. এইচ. গ্রীন একে ইংলণ্ডে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং প্রয়াত ডঃ বোসাঙ্কে এই মতবাদকে বিস্তারিত রূপ দেন। তাঁর 'দি ফিলসফিক্যাল থিওরী অফ দি স্টেট্' গ্রন্থে রাষ্ট্র সর্বস্য মতবাদের সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিককালে ভাববাদের তত্ত্বগত দিক নানান দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র ভাবে সমালোচিত হয়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রগুলির প্রকৃত কার্যকলাপ এই মতবাদের কাছ থেকে দার্শনিকসুলভ বিচারে বেশ কিছু স্বীকৃতি পেয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এর ফলে এই মতবাদের বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। আর তার ফলে মানুষ চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার বিকল্প হিসেবে রাষ্ট্র সম্পর্কিত অন্যতর তত্ত্বের সন্ধানী হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখব যে আজকাল সাধারণ ভাবেই এক ধরনের রাষ্ট্র সম্পর্কে বিরূপতার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

অথচ এই মতবাদের দার্শনিক দিকটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মতবাদ তার মৌলিক বক্তব্যকে ভিত্তি করেই সুসমঞ্জস ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং যে সিদ্ধান্তগুলিতে তা পৌঁছয় সেগুলিকেও নস্যাৎ করা যায় না, যদি না আমরা যে সূত্রগুলি থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, সেগুলিকেই অস্বীকার করি।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে প্রথমে এই মতবাদের উৎপত্তি নির্ণয়, পরে এর প্রবক্তাদের প্রধান বক্তব্যগুলির বিবরণ এবং পরিশেষে এর বিরুদ্ধে মুখ্য সমালোচনাগুলির রূপরেখা বর্ণনা করবার ইচ্ছা রইল।

Scanned with CamScanner

I চরম কর্তৃত্ববাদী মতবাদের উৎপত্তি

রাষ্ট্র সম্পর্কে চরম কর্তৃত্ববাদী মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে দুটি পৃথক উৎস থেকে। এ-দুটি উৎসের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় গ্রীক চিন্তার ক্ষেত্রে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থারূপে গণ্য করা এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন মনে করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাই আকস্মিক ভাবে অ্যারিস্টটল ঘোষণা করলেন যে রাষ্ট্রের প্রকৃতিই হল স্বয়ং-সম্পূর্ণতা। প্লেটোরও প্রায় একই মত। যেখানে অন্যান্য রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে রাষ্ট্রগুলিকে পরস্পরের প্রতি অনিবার্য ভাবে বৈরীভাবাপন্ন মনে করা হয়েছে। গ্রীনিজ এর মতে গ্রীক রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক বা বৈধ সম্পর্ক ছিল প্রচ্ছন্ন বৈরীভাবের, এবং এটাই স্বীকৃত সম্পর্ক। দার্শনিক গ্রোটিয়াস রাষ্ট্রের যাবতীয় বাহ্য নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির তত্ত্বের প্রবক্তা এবং হবস্‌ও এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলেন যে রাষ্ট্রগুলি প্রকৃতিগত ভাবেই একে অপরের শত্রু।

অতএব রাষ্ট্র ও সমগ্র মানবসমাজকে অভিন্নরূপে গণ্য করে আলোচনা চলতে লাগল। অনেকে যে দুটি সম্পর্ককে (যথা কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তির সম্পর্ক ও মানব জাতির একজন হিসেবে সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক) সম্পূর্ণ পৃথক বিশিষ্ট সম্পর্ক রূপে গণ্য করেন, সে দুটিকেও অভিন্ন বলে মনে করা হতে লাগল। রাষ্ট্রই মানুষের সকল সামাজিক আশা আকাঙ্খার ধারক ও বাহক এবং সেই সঙ্গে তার সকল সামাজিক প্রয়োজন রাষ্ট্রই মেটায়, অতএব ব্যক্তির কাছে রাষ্ট্রের দাবি তার চূড়ান্ত কর্তৃত্বের সঙ্গত অধিকার রূপে বিবেচিত হতে থাকল। অন্যান্য সংস্থার দাবি রাষ্ট্রের দাবির তুলনায় গৌণ হিসেবে ধরে নেওয়া হল।

যে দ্বিতীয় চিন্তাধারাটি চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তার সূত্রপাত গ্রীকদের মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণায়। রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কে লেখকদের অনেকেই মনে করেন যে সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করবার পূর্বে প্রকল্পিত প্রাকৃত অবস্থায় মানুষের চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাই তার প্রকৃত ও মৌলিক চরিত্র। ফলতঃ ব্যক্তিমানুষেরা প্রকৃতির অসহনীয় নিরাপত্তাহীনতার হাত এড়ানোর জন্য যে নির্দিষ্ট চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে তারই পরিণতি স্বরূপ সেই প্রাকৃত ও আদিম মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়া

Scanned with CamScanner

এক কৃত্রিম সংগঠন রূপেই সমাজকে গণ্য করা হয়েছে। সমাজ উৎপত্তি সম্পর্কিত এই মতবাদই সামাজিক চুক্তিমতবাদ নামে পরিচিতি।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল মানুষ ও সমাজ উভয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে একেবারেই পৃথক এক ধারণা উপস্থাপন করলেন। মানুষকে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক জীব হিসাবে চিহ্নিত করে তাঁরা বললেন যে মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে সে সমাজে বাস করবে। সকলের কাছ থেকে দূরে সরে ব্যক্তির নিঃসঙ্গ জীবনযাপন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং ফলে ব্যক্তির প্রকৃত সত্তার বিকাশ একমাত্র সমাজ-মাধ্যমেই সম্ভব। শুধুমাত্র সমাজের মধ্যে বাস করেই মানুষ তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও সম্ভাবনাগুলিকে উপলব্ধি করতে পারে। সঙ্গীদের সাথে আদান প্রদান বা সংস্রবের দ্বারা এবং সামাজিক কর্তব্য উপলব্ধি ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করেই, মানুষ তার সত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। তাই রাষ্ট্রের কাছ থেকে ব্যক্তি হিংসার হাত থেকে নিরাপত্তা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের যে প্রত্যক্ষ সুবিধা পায় তা ছাড়াও রাষ্ট্র তার স্বকীয়তার ঐশ্বর্য ও সম্ভবানাগুলি সৃষ্টি করে বলে সে রাষ্ট্রের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

II তত্ত্বের উপস্থাপনা

রাষ্ট্রই মানবিক 'যথার্থ ব্যক্তিত্বের' জনক ও রক্ষক এই ধারণা হেগেলীয় দর্শনের মধ্যে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর মতে মানুষ প্রকৃতির নিয়মশৃংখলাহীন প্রকল্পিত প্রাকৃতিক পরিবেশ ত্যাগ করে সমাজে প্রবেশের পূর্বে যে স্বাধীনতা ভোগ করত সমাজের সদস্য হিসেবে তদপেক্ষা অধিক বাস্তব ও প্রকৃত স্বাধীনতা সে ভোগ করে। কেবলমাত্র সমাজ-পরিবেশেই সম্ভবপর এই স্বাধীনতা ব্যক্তি-চিত্তে স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে মহত্তম ধারণারই বাহ্যিক বা বাস্তবায়িত রূপ। সমাজ ব্যতিরেকে এই ধারণা অনুপলব্ধই থেকে যেত। হেগেলের ভাষায়ঃ 'রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানুষ তার বহিঃ-সত্তাকে তার অন্তঃসত্তার আশা আকাংখার স্তরে পরিপূর্ণভাবে টেনে তুলেছে।' সমাজভিত্তিক ও সমাজ সৃষ্ট এই প্রকৃত স্বাধীনতা সমাজমাধ্যমেই সক্রিয় এবং বিকাশমান। এই স্বাধীনতা প্রকাশিত হয় প্রথমতঃ সামাজিক বিধি নিয়মে, দ্বিতীয়ত ব্যক্তির সমাজলব্ধ বিবেকী নৈতিকতার অনুশাসনে এবং তৃতীয়তঃ ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক

Scanned with CamScanner

সর্ববিধ সমাজ-সংস্থা ও প্রভাবের সামগ্রিক প্রকরণে।

রাষ্ট্র এইভাবে ব্যক্তির পক্ষে অন্যথা-অনধিগম্য স্বাধীনতাকে সম্ভবপর করে তোলে। হেগেলের বক্তব্য : 'রাষ্ট্রব্যতিরেকে অন্যকিছুই এই স্বাধীনতার বাস্তবায়ন নয়।' রাষ্ট্রের স্বকীয় ধর্মেই এই বাস্তবায়ন ঘটে, কারণ রাষ্ট্র নিজেই প্রকৃত ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন একটি প্রকৃত ব্যক্তিত্ব। সমাজ-বদ্ধ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ নাগরিকদের সমস্ত ইচ্ছাগুলির প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে রাষ্ট্র একক ইচ্ছাগুলির যোগফলের অতিরিক্ত একটি নতুন সত্তাকে সৃষ্টি করে যার নাম সাধারণ ইচ্ছা এবং একক ব্যক্তিত্বগুলির যোগফলের অতিরিক্ত একটি নতুন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে যার নাম 'রাষ্ট্রব্যক্তিত্ব'। এই 'সাধারণ ইচ্ছা' ও 'রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বে' প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্ব লীন হয়।

'সাধারণ ইচ্ছা' সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে প্রতিটি প্রশ্নের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই এর উপস্থিতি নিশ্চয়াত্মক যদিও কার্যকালে এর প্রকৃত অভিব্যক্তি না-ও ঘটতে পারে। এই 'সাধারণ ইচ্ছা' সর্বদা সুনিশ্চিত ভাবে যুক্তি-পূর্ণ এবং যথার্থ কারণ তা ব্যক্তির ইচ্ছার সেই বিশেষ দিকটির প্রতিভূ যা অপরের ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তি-ইচ্ছার সামঞ্জস্য সাধন করে অর্থাৎ অপরের কল্যাণবিমুখ আত্মসুখ কামনা নয় সকলের কল্যাণের অন্তর্গত-আত্ম-শুভেচ্ছা। বস্তুত তা হল সর্ব-ইচ্ছার শ্রেষ্ঠাংশের রূপান্তরিত ও পরি-শীলিত নির্যাস ; সর্ব ইচ্ছার গাণিতিক সমষ্টি থেকে তা সুস্পষ্টভাবে আলাদা। ফলে সাধারণ ইচ্ছার পরিসরে স্ব-ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটিয়েই ব্যক্তি তার যথাসাধ্য মহত্তম চিন্তাশক্তির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। কাজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, যে সাধারণ ইচ্ছা থেকে নির্গত রাষ্ট্রের কর্মধারা সর্বদা অনিন্দনীয় ভাবে নির্ভুল হবে যেহেতু তা ব্যক্তি-ইচ্ছার শ্রেষ্ঠ দিকগুলিরই প্রতিনিধি।

রাষ্ট্রব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে, একথা স্পষ্ট যে রাষ্ট্র একটি প্রকৃত ব্যক্তি এবং নিজেই নিজের লক্ষ্যস্থল। রাষ্ট্রের আছে স্বকীয় অধিকার। ব্যক্তির তথাকথিত অধিকার সঙ্গে আপাত সংঘাতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রাধিকারের জয় অবিসংবাদিত। ব্যক্তির এমন কোন 'প্রকৃত' অধিকার থাকতে পারে না যা রাষ্ট্রাধিকারের বিরোধী এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই 'তথাকথিত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তার কারণ সমাজ-পূর্ব কোন প্রকল্পিত অবস্থা থেকে বয়ে নিয়ে আসা কোন অধিকার ব্যক্তির 'প্রকৃত'

Scanned with CamScanner

স্বাধিকার নয়, তার পুনর্গঠিত সত্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য অনুসার্য অধিকারগুলিই ব্যক্তির 'প্রকৃত' স্বাধিকার। পরন্তু, সমাজের সদস্য হিসেবে তার যে-প্রকৃতি, (এই প্রকৃতি সমাজেরই দান,) কেবলমাত্র তা-ই এই লক্ষ্যগুলিকে আয়ত্ত করতে চায়। কাজেই সমাজ যে শুধু ব্যক্তি যে-সমস্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় সেগুলিকেই নির্দিষ্ট করে তা-ই নয়, এই লক্ষ্য অনুসরণের অধিকারও সমাজই ব্যক্তিকে দেয়। যেহেতু ব্যক্তি রাষ্ট্রের কাছ থেকেই তার অধিকারগুলি পায় সে কারণে তার এমন কোন অধিকার থাকতে পারে না যা রাষ্ট্রের অধিকার সমূহের পরিপন্থী।

সাধারণ ইচ্ছা, রাষ্ট্র-ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃত অধিকার-এর প্রকৃতি সম্পর্কে বিবেচনা প্রসঙ্গে যে যুক্তিধারার উদ্ভব ঘটেছে সেগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে আমরাও হেগেলের মতো রাষ্ট্রকে 'একটি আত্মসচেতন নৈতিক বস্তু এবং আত্মচেতনাসম্পন্ন আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি' রূপে গণ্য করতে পারি।

এই ধারণা থেকে আমরা আপাতঃদৃষ্টিতে কতকটা পরস্পরবিরোধী তিনটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই।

প্রথমত, রাষ্ট্র এমন কোন কাজ করতে পারে না যা প্রতিনিধিত্বমূলক নয়।

যে পুলিশ সিঁদেল চোরকে গ্রেফতার করে এবং যে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে জেলে ঢোকায় তারা দুজনেই—চোরটির গ্রেফ্‌তার হওয়া ও জেলে ঢোকার প্রকত ইচ্ছা'কেই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী করছে। কারণ পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট দুইজনেই রাষ্ট্রের কর্মচারী—যে রাষ্ট্র তার সদস্য হিসেবে চোরটির 'প্রকৃত ইচ্ছা'রই প্রতিনিধিত্ব করছে এবং তাকেই প্রকাশ করছে। অধিকন্তু রাষ্ট্র-মাধ্যমে মানুষ যে স্বাধীনতা পায় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-একক হিসেবে প্রাপ্ত তার বিমূর্ত ও অপ্রকৃত স্বাধীনতার তুলনায় যেহেতু তা প্রকৃত ও বাস্তব-স্বাধীনতা অতএব থানায় যখন তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সিঁদেল চোরটি তখন স্বাধীনভাবেই সক্রিয়। বস্তুত স্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে সম্পর্ক হল অভিন্ন। কারণ আইনের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, যে-সম্পর্কগুলি কোন ব্যক্তিকে শুধু সমাজের অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গেই নয়, সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গেও সম্পর্কিত করে সে গুলি তার ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ-গুলি ছাড়া সে যা তা সে হত না; শুধু

Scanned with CamScanner

এগুলির জন্যই সে-যা, তা-ই হতে পেরেছে। কাজেই একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি একক হিসেবে নয় রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই সক্রিয় হতে পারে; এবং তার ইচ্ছা নিছক ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয়, রাষ্ট্রের ইচ্ছার অংশ মাত্র। তাই, ডঃ বোসাঙ্কের মতে, রাষ্ট্রদ্রোহের সময়েও ব্যক্তি-ইচ্ছার রাষ্ট্র-ইচ্ছার বাইরে কোন উৎস নেই, এই বিদ্রোহের ইচ্ছাও ব্যক্তি পায় রাষ্ট্রের কাছ থেকেই; এই ইচ্ছা রাষ্ট্র-ইচ্ছারই সমপ্রবাহী। অর্থাৎ বিদ্রোহের সময়ে রাষ্ট্র স্ব-বিরোধিতায় বিভক্ত।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্র সর্বসাধারণের সামাজিক নৈতিকতার আধার এবং প্রতিভূ। ঠিক যেমনি সর্বজনের ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বে লীন, তেমনি সর্বজনের পারস্পরিক নৈতিক সম্পর্ক সামাজিক নৈতিকতার দ্বারা লীন ও অতিক্রান্ত। এই সামাজিক নৈতিকতার ধারক হল রাষ্ট্র। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র নিজে নীতি-নিয়ন্ত্রিত বা নৈতিক সম্পর্ক দ্বারা তার ক্রিয়াকাণ্ড সীমায়িত। কারণ নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষের অস্তিত্ব আবশ্যিক এবং রাষ্ট্র যেহেতু সমস্ত পক্ষেরই সমষ্টি, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোন অপর পক্ষ থাকতে পারে না। রাষ্ট্রাতিরিক্ত অপর কোন রাষ্ট্র বা পক্ষের অস্তিত্ব এখানে উপেক্ষিত তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। এ চিন্তাধারা সম্পর্কে ডঃ বোসাঙ্কের বক্তব্য ঃ বৃহত্তর সমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়, রাষ্ট্র নিজেই হল সর্বোচ্চ সামাজিক সংস্থা; একটি সম্পূর্ণ জগতের অভিভাবক, কিন্তু একটি সংগঠিত নৈতিক জগতে এর কোন ভূমিকা নেই। সমস্ত ব্যাপারটিকে সংক্ষেপে বলতে গিয়ে তিনি স্পষ্টতই বলেন ঃ 'চুরি বা খুনের মতো নৈতিক অপরাধগুলি রাষ্ট্র কি ভাবে করে তা বোঝা শক্ত।'

এই ভাবে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ববাদী তত্ত্বে এগোনো হয়। তত্ত্বগত ভাবে সর্বদা এবং বাস্তবে যুদ্ধকালে নাগরিকদের জীবনের উপরে রাষ্ট্র তার সর্বাত্মক কর্তৃত্ব, (এবং তা আইনসঙ্গত ভাবেই) ফলাতে পারে। তত্ত্ব বা আইনের দিক থেকে রাষ্ট্রাদেশকে প্রতিরোধ করবার কোন উপায় নেই, কারণ যাদের উপরে কর্তৃত্ব করা হচ্ছে তাদের এবং কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং রাষ্ট্রাদেশের প্রেরণা যারা তাকে এমনকি অনিচ্ছাতেও, মেনে নেয় তাদেরই প্রকৃত ইচ্ছা। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্র যা খুশী তাই করতে পারে আর কি হলে জরুরী অবস্থা হয় রাষ্ট্র নিজেই তা ঠিক করে থাকে। ডঃ বোসাঙ্কে বলেন ঃ 'কখন তার প্রয়োজন হবে সাংবিধানিক

Scanned with CamScanner

পদ্ধতিতে তা স্থির করবার ভার একমাত্র রাষ্ট্রেরই।' রাষ্ট্র তার নিজের প্রয়োজনে নাগরিকদের জীবন নিয়োগ করবার আহ্বান জানাতে পারে। বস্তুত যুদ্ধাবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার মধ্যেই রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্ববাদী তত্ত্বের পরিণতি ঘটে। হেগেল-এর বক্তব্য ঃ 'যুদ্ধাবস্থা রাষ্ট্র-ব্যক্তিত্বের সর্বময় ক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়; দেশ ও পিতৃভূমিই তখন সেই শক্তি বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিলয় ঘটায়।'

এ কথা সত্য যে কোন কোন ইংরেজ চিন্তাবিদ রাষ্ট্রের চরমকর্তৃত্ব-বাদী তত্ত্বের যাবতীয় তাৎপর্য মেনে নিতে রাজী হননি; অন্তত কোন মতেই তাঁরা জার্মান লেখক বার্ণহার্ডি ও ট্রিট্‌স্কের মতো উচ্চণ্ড যুক্তিতে সেগুলি প্রয়োগ করতে পারেন নি। পূর্ব-বর্ণিত 'প্রকৃত অধিকার তত্ত্বের প্রবক্তা টি. এইচ. গ্রীন-এর মতে ব্যক্তির বিবিধ অধিকারের অন্যতম হল তার জীবন ধারণের অধিকার'। যুদ্ধাবস্থায় রাষ্ট্রের চরম প্রশ্নাতীত ক্ষমতা এই অধিকারের পক্ষে বিপজ্জনক। গ্রীন তাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে যুদ্ধ বড়জোর আপেক্ষিক ভাবে সঙ্গত হলেও তা কখনো চূড়ান্ত ভাবে সঙ্গত নয়। তাঁর মতে যুদ্ধ আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নয়, তা হল কোন বিশেষ রাষ্ট্রের ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবতারই একটি অবস্থা। এ-থেকে প্রত্যক্ষতই যে প্রশ্নটি আসে তা হল কোন বিশেষ যুদ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে 'আপেক্ষিক ভাবে সঙ্গত' নয় যাতে করে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে তার নিজের ও অপরের 'জীবন ধারণের প্রকৃত অধিকার'কে বিপন্ন করা যেতে পারে এ-সিদ্ধান্ত করবার এখতিয়ার কোন ব্যক্তির আছে কিনা? গ্রীন এ-প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। কোন যুদ্ধকে আপেক্ষিক ভাবে অন্যায় বলে মনে করে এমন-কোন প্রতিরোধকারী ব্যক্তির 'জীবন ধারণের অধিকার'কে রাষ্ট্র কত খানি অগ্রাহ্য করতে পারে—পরবর্তী এই প্রশ্নটিও তাঁর আলোচনায় স্থান পায়নি।

যা হোক্ কোন কোন ইংরেজ লেখক এই তত্ত্বে যে-সব পরিবর্তন, (সেগুলিও সম্ভবত খুব সঙ্গতিপূর্ণ নয়), এনেছেন সেগুলিকে বাদ দিলে এর সাধারণ প্রবণতা যথেষ্ট পরিমাণে স্পষ্ট। রাষ্ট্র মানবিক সংগঠনের একটি স্বাভাবিক, আবশ্যিক ও চূড়ান্ত রূপ। পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মাধ্যমে রাষ্ট্র একাধারে সর্বশক্তিমান ও চরম। বর্তমান রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রত্ব রাষ্ট্রের যথাযথ বিকাশকে তারা কতটা আয়ত্ব করে তার উপরেই নির্ভর করে। যে পরিমাণে তারা সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে সেই পরিমাণে

Scanned with CamScanner

তারা অনুমোদনের অযোগ্য কারণ রাষ্ট্রত্বের নূন্যতা আমাদের কাম্য নয়, আমরা বরং তার আধিক্যই আকাঙ্খা করি। তা ছাড়াও রাষ্ট্রের আছে একটি প্রকৃত ইচ্ছা এবং তার নিজস্ব একটি প্রকৃত ব্যক্তিত্ব। আর এগুলি যেহেতু সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও ইচ্ছার শ্রেষ্ঠ অংশের নির্যাসিত যোগফল রাষ্ট্রের উপরে তাই, (নৈতিক ভাবে না হলেও), আধা স্বর্গীয় মহিমা আরোপ করা হয়। এই ভাবে রাষ্ট্র তার সর্বোত্তীর্ণ চরিত্র ও নিজ-সদস্যদের উপরে যে নিষ্ঠা ও ত্যাগের ধর্ম সে আরোপ করে তার প্রভাবে তাদের ভেতর থেকে ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য ও মানবিক স্বার্থপরতা নিষ্কাশন করে তাদের ব্যক্তিত্বের পরিধিকে বিস্তৃত করে ; হেগেল বলেন ঃ 'রাষ্ট্র আত্ম-কেন্দ্রপ্রবণ ব্যক্তিকে সর্বজনীনতায় উত্তীর্ণ করে'।

স্বভাবতই প্রতিবাদ ওঠে যে কোন রাষ্ট্রই কোনদিন এ-সব কাজ কিছুই করে না। উত্তরে চরম কর্তৃত্ববাদী বলেন যে প্রচলিত রাষ্ট্রসমূহের কার্য-কলাপ তাঁর বর্ণনীয় নয় ; আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যই তিনি বর্ণনা করেন আর তা-ই করাটাই তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণ আদর্শ রাষ্ট্রই হল প্রকৃত রাষ্ট্র অন্য সব রাষ্ট্র যে পরিমাণে আদর্শ রাষ্ট্র থেকে পিছিয়ে থাকে সেই পরিমাণে তারা রাষ্ট্র নয়।

III মতবাদের সমালোচনা

সাম্প্রতিক রাষ্ট্রচিন্তায় চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র-দর্শন সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া ঘটেছে তা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখানো হবে। এই মতবাদ তত্ত্বের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ, বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, এবং বর্তমান রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অধিকতর ন্যায় নীতিহীন কাজকে স্বীকৃতি দেয় বলে তার নিন্দা করা হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্র বা তার সমতুল সমাজে সার্বভৌমত্বের ধারক কোন সংস্থার অস্তিত্বের প্রয়োজন পর্যন্ত কেউ কেউ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। প্রথমে এই মতবাদ সম্পর্কে তত্ত্বগত আপত্তিগুলি, পরে সমালোচকদের মতে যে যে বিষয় এই মতবাদে উপেক্ষিত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

(ক) তত্ত্বগত আপত্তি

রাষ্ট্র ও মানবসমাজের সমগ্রতা এক ও অভিন্ন—বাস্তব দৃষ্টে ভ্রান্ত এই

অনুমান তার সঙ্গে জড়িত কতকগুলি সিদ্ধান্তেও বিকার ঘটায়। ফলে, এমনকি যদি তার নিজের নাগরিকদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার দাবি মেনে নেওয়াও যায় তা হলেও এটা স্পষ্ট যে এই দাবি রাষ্ট্র তার অন্তর্ভূত সকল ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেগুলিকে চূড়ান্ত রূপ দেয় এই অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের নাগরিকদের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে এমন কোন কথা বলা হয়নি। তাই তাদের সম্পর্কে রাষ্ট্রটি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়। যেহেতু সর্বময় ক্ষমতার দাবিকে নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে ছাড় পাবার অন্যতর দাবির ন্যায্যতার সমর্থনে ব্যবহার করা হয় তথাপি একথা ঠিক যে এই নিষ্কৃতি অপরাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সেই রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনই প্রযোজ্য নয়। রাষ্ট্রটি অপরাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই 'সমগ্র পৃথিবীর অভিভাবক' নয় এবং 'একটি সংগঠিত নৈতিক জগতে একটি অংশ-একক মাত্র'। অতএব একটি রাষ্ট্রের স্বেচ্ছামূলক সংস্থার অনুরূপ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যতখানি অনৈতিক কার্যকলাপের যৌক্তিকতা আছে অপরাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রেরও তার বেশী নেই।

বস্তুত যদি এক ব্যক্তির সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে সম্ভাব্য নির্ধারক নীতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তবে কয়েকজন বা একদল ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাকে হঠাৎ অনুরূপভাবে কেন মানা হবে না তার কোন যুক্তি নেই। একথা মেনে নিলে বোঝা কঠিন হয় কেন নৈতিক অপরাধের অর্থে গীর্জা বা কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের চাইতে রাষ্ট্রের পক্ষে চুরি বা খুন করা বেশী শক্ত হবে।

কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে তার নাগরিকদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি বাস্তবত আলাদা? এটা স্বীকার্য যে মানুষ সামাজিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই তার পূর্ণ প্রকৃতি—বৈশিষ্ট্য বিকশিত করতে পারে এবং শুধু সমাজ পরিবেশেই সে প্রকৃত স্বাধীনতা আয়ত্ত করতে পারে। মরুদ্বীপে পরিত্যক্ত একজন লোকও স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু সে স্বাধীনতা বিমূর্ত এই অর্থে যে যদিও তার যা-খুশি তা-ই করার বাধা নেই তবু সেখানে তার প্রকৃতপক্ষে করণীয় কিছু থাকে না। কিন্তু এ-কথা মেনে নেবার অর্থ রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার স্বীকৃতি নয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ব্যক্তির প্রয়োজনে, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তির অস্তিত্ব নয়। স্বাধীনতা শুধু

Scanned with CamScanner

ব্যক্তির জীবনেই অর্থবহ জনগণের কল্যাণমুখী না হলে সমাজ বা রাষ্ট্রের কল্যাণ নিরর্থক ও মূল্যহীন। অন্যভাবে বলা যায় রাষ্ট্র এবং সমাজ নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্য নয়।

এ-কথা উপলব্ধি করলে, এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ব্যক্তির সুখ উপেক্ষা করে বা ধ্বংস করে রাষ্ট্রকল্যাণ সম্ভবপর রাষ্ট্র সম্পর্কে যে তত্ত্ব এমন সম্ভাবনাকে স্বীকার করে এবং একক ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রব্যক্তিত্ব দ্বারা বিধৃত এবং আচ্ছন্ন এই যুক্তিতে এই স্বীকৃতির যাথার্থ প্রমাণ করে, তা হল ফলত গাড়িটাকে ঘোড়ার আগে জুড়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার। রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তি কল্যাণের হানি ঘটিয়ে আত্মকল্যাণ সাধন সম্ভব নয় অথবা রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তির প্রতি উৎপীড়ন করাও সম্ভব নয় কারণ রাষ্ট্রের ইচ্ছা এমনকি উৎপীড়ন করবার সময়েও উৎপীড়িত জনগণেরই ইচ্ছা—এই যুক্তি যা এই তত্ত্বের সমর্থকরা উক্ত বিরূপ সমালোচনার জবাব হিসেবে উপস্থিত করেন তা-ও গ্রহণযোগ্য নয়। যে সমিতির আমি সদস্য আমার ইচ্ছা ও মতের বিরুদ্ধে গৃহীত সেই সমিতির কোন সিদ্ধান্ত আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হতে পারে না। রাষ্ট্রের মধ্যে একত্র বাস করে বলেই মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রে এমন কোন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটায় না যার ফলে গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে তাদের ইচ্ছা একেবারেই সম্পূর্ণ বিপরীত আকারে পরিবর্তিত হতে পারে। একটা ক্রিকেট ক্লাবের সভায় ভোটে হেরে যাওয়া সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর তাদের বিপক্ষীয়দের মতকে একেবারে নিজেদের করে নেবার মতই চরম বিস্ময়কর ব্যাপার হবে সেটা।

'প্রকৃত' ইচ্ছা (যার সম্বন্ধে আমি অনবহিতও থাকতে পারি) এবং তথাকথিত অপ্রকৃত ইচ্ছার (সাধারণত এর সম্বন্ধে আমি সচেতন ভাবেই অবহিত) মধ্যে পার্থক্যেও কোন সারবত্তা নেই। এই 'প্রকৃত' ইচ্ছার সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয় যে এ হল যে গোষ্ঠীর আমি অন্যতম তার সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে (যদিও বস্তুত আলোচ্য সিদ্ধান্তগুলি যে ভুল সেটা আমার সচেতন বিশ্বাস) কার্যকরী করবার ইচ্ছা। ব্যক্তির উপরে 'প্রকৃত' ইচ্ছার (যা সর্বদা স্বাভাবিক ভাবেই 'সাধারণ ইচ্ছা'র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাতেই লীন হয়) আরোপ সার্বভৌম রাষ্ট্রের যে কাজগুলিকে অন্যথায় স্বৈরাচারী ও উৎপীড়ন মূলক বলে মনে হয় তাদের গণতান্ত্রিক ন্যায়ের আকৃতি দেবার একটা কৌশল মাত্র এ সিদ্ধান্ত এড়ানো শক্ত। রাষ্ট্রের চরম কর্তৃত্ববাদী মতবাদ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-

Scanned with CamScanner

স্বাধীনতার পরিপন্থী কারণ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে এ-তত্ত্ব রাষ্ট্রকে অবশ্যই সঠিক বলে মনে করে।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ইচ্ছা অভিন্ন এই মতে সন্দেহ প্রকাশ করবার অর্থ এ নয় যে তারা সর্বদা পরস্পরবিরোধী। ব্যক্তি ও সমাজের বিবিধ দাবি ও সেগুলির পরস্পর বিরোধ নয়, বরং কি পরিমাণ এবং কোন্ ধরনের সংগঠন সব চেয়ে বেশী ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিশ্চিত করবে সেইটেই সমাধান যোগ্য আসল প্রশ্ন।

(খ) ব্যবহারিক বিবেচনা

সমস্যাটি এই ভাবে বিবৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত যে স্বেচ্ছামূলক সংস্থাগুলি বিগত অর্ধ-শতককে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে তাদের সংখ্যাগত বৃদ্ধির বিপুলতা সম্বন্ধে তত্ত্ববিদদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন হয়ে ওঠে। এই সংস্থাগুলি প্রধানতঃ দুই প্রকারের ; আর্থ-নীতিক উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যক্তিসংস্থা এবং নৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা।

আর্থনীতিক উদ্দেশ্যযুক্ত সংস্থাগুলির বৃদ্ধি লালিত হয়েছে যোগা-যোগ ব্যবস্থার বর্ধিত সুযোগসুবিধার দ্বারা। আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার এই উন্নতি সমগ্র সভ্য জগতকে একটি মাত্র সামাজিক এককরূপে সংগঠিত করেছে। রাজনীতিক ভাবে বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও আর্থনীতিক বিচারে মানব-সমাজে আজ সেই সাং-স্থানিক পরস্পর নির্ভরতায় সুস্থিত যা রাষ্ট্রসম্পর্কে ভাববাদী তত্ত্ব অনুযায়ী রাজনীতিক ভাবে একটি রাষ্ট্রের সারবস্তু ; বলা যেতে পারে মানবসমাজের যে কোন অংশের আর্থনীতিক কল্যাণ অবশিষ্ট অংশের কল্যাণের উপরে নির্ভরশীল। নর্মান এঞ্জেল বলেন 'সভ্যজগতের জন্য টেলিগ্রাফ লেনদেনের একটিই মাত্র ব্যবস্থা ; এই লেনদেন ব্যবস্থার সঙ্গে সকল রাষ্ট্রের আর্থিক পরস্পর নির্ভরতা জড়িত।'

অতীতে মানুষে মানুষে সম্পর্কের একমাত্র না হলেও প্রধান ভিত্তি ছিল একই দেশে জন্মগ্রহণ। এই প্রাচীন রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের পরিবর্তে অর্থোপার্জনের সামাজিক স্বার্থে আর্থনীতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা, আর্থ-নীতিক সংস্থাগুলির প্রসারেরই পরিণতি। বর্তমান সমাজে কোন ব্যবসায়িক সংস্থার একজন সদস্যের যদি ব্রাজিলে কমলালেবুর উৎপাদন ও সেখান থেকে তা আমদানী করা উদ্দেশ্য হয় তবে সে লণ্ডনের শহর-

তলীতে তার নিকটতম প্রতিবেশীর কল্যাণের চাইতে যে ব্রাজিলবাসীরা কমলা উৎপাদন ও রপ্তানী করে তাদের কর্মক্ষমতা ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে বেশী আগ্রহী হবে ; তার প্রতিবেশীকে সে হয়তো চেনেই না, চিনলেও হয়তো অত্যন্ত অপছন্দই করত তাকে।

বলা যেতে পারে যে মানব-সংস্কৃতির নির্ধারিক উপাদানগুলির প্রকৃতিতে এই পরিবর্তন এবং তার ফলে ব্যক্তির আগ্রহের দিক পরিবর্তন অন্তত আঞ্চলিক সান্নিধ্যের ভিত্তিতে মানবসমাজের বর্তমান বিভাজন ব্যবস্থার বদলে নিবিড় আর্থনীতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সমাজ সংগঠনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

নৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থাগুলির ব্যাপারও আলাদা কিছু নয়। ঊনিশ শতকের ব্যক্তিতান্ত্রিক চিন্তার ফলে গ্রীক নৈতিকতার তত্ত্ব বর্জনের একটা সাধারণ ঝোঁক দেখা দিয়েছে। গ্রীক নীতিতত্ত্ব অনুসারে ব্যক্তির পক্ষে সৎ-জীবনের একটিমাত্র বা বড়জোর দুটো, কি তিনটে ধরন আছে। আর এই জীবনের উন্নতি ঘটানো রাষ্ট্রের কাজ। বিপরীতক্রমে, আমাদের মতে ব্যক্তির প্রকৃতির অজস্র বিভিন্নতা অনুযায়ী সৎ-জীবন সম্পর্কে অসংখ্য ধারণা থাকতে পারে এবং এই বিবিধ ধারণার মধ্য থেকে নিজের মতো করে বেছে নেবার দায়িত্ব স্বয়ং ব্যক্তিকেই দিতে হবে এ-কথাটা অবশ্য-স্বীকার্য। শুধুমাত্র জনগণের মাধ্যমেই কোন যুগের অস্ফুট আশা আকাঙ্খা এবং ধর্মীয় পরিজ্ঞান রূপ পায়, এবং তার ফলে আচরণ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভাব-সমতার চাইতে স্বতঃস্ফূর্ততা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং চাপ ধর্মের ক্ষেত্রে অনুরূপ জটিলতা সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় চাহিদা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একটি মাত্র গীর্জায় এখন আর তৃপ্ত হয় না এবং ফলত নৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বিভ্রান্তিকর ভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। এগুলি পূর্বোল্লিখিত আর্থনীতিক সংস্থাগুলির মতো রাষ্ট্রীক সীমাকে আমল না দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের (থিওসফিক্যাল সোসাইটি, রোমান ক্যাথলিক চার্চ বা, খ্রীষ্টিয় বিজ্ঞান সংস্থার মতো) সাগ্রহে গ্রহণ করে।

এই সংস্থাগুলির প্রভাবে লোকের মনে রাষ্ট্রনির্দেশিত চিরাচরিত নৈতিকতার বদলে স্বকীয় নীতিধর্ম পালনের প্রবণতা জাগে এবং তার

Scanned with CamScanner

ফলে নিজেদের ধারণামাফিক সংজীবন যাপনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের যে-কোন উদ্‌যোগকে নৈতিক কারণেই অবাঞ্ছিত মনে করে। লোকে ব্যক্তিগত জীবনে যে নৈতিক আচরণ করে সমাজ জীবনে (বিশেষতঃ রাজনীতিতে তার যা প্রকাশ) নৈতিকতা প্রায়শই তার চাইতে নিম্নমানের। শুধু বাহ্যত রাষ্ট্রবিধি মেনে চলবার জন্য উচ্চমানের নৈতিকতার দরকার নেই। ফলে আইননিষ্ঠ মানুষ যে অবশ্যই নীতি-নিষ্ঠ হবে এমন কোন কথা নেই, আবার আইন-রচয়িতা নীতি বিগর্হিত হবে এমন ঘটনাও বিরল নয়।

এমতাবস্থায় নৈতিক বিষয়ে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে যখন বিরোধ দেখা দেয় তখন ব্যক্তি যদি তার মীমাংসার অধিকার নিজেই দাবি করে শুধু তাই নয়, পরন্তু যে আর্থনীতিক বা নৈতিক স্বেচ্ছা প্রতিষ্ঠানের সে সদস্য তার দাবিকে যদি রাষ্ট্রের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয় তবে সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে না।

কাজেই এ-সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ভাববাদী তত্ত্ব যখন, অধ্যাপক বোসাঙ্কে-র বক্তব্যানুসারে, 'প্রয়োজন অনুসারে সাংবিধানিক উপায়ে, যে সমাজের সে প্রতিনিধিত্ব করে তার প্রতি ছাড়া বহির্ভূত কোন সংস্থার প্রতি আনুগত্যে—বাধানিষেধ আরোপের একমাত্র নিঃসংশয়িত বিচারক রাষ্ট্র' এ-কথাতে জোর দেয় তখন তা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উপেক্ষা করে।

পূর্বালোচিত ধরনের স্বেচ্ছাসংস্থাগুলি যে বর্তমানে ব্যক্তির জীবনে যাবতীয় ঘনিষ্ঠতম বিষয়কে তার অন্তর্ভূত করে, ব্যক্তির আর্থিক বা আত্মিক সমৃদ্ধির সহায়ক সকল সক্রিয়তা যে রাষ্ট্রের থেকে পৃথক উদ্দেশ্য সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই চালিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা-ভিত্তিক নানা সামাজিক স্তর বিভাজন থেকে পৃথক্ (এবং তার বিরোধী) সমাজের অন্যতর এক স্তরবিন্যাসকে নির্দেশ করে, (বস্তুত এই স্তর বিন্যাসকে সৃষ্টি করে),—এসব কথাকে ভাববাদী তত্ত্ব গ্রাহ্য করে না।

বিশ শতকের প্রথম দশকে রাষ্ট্রের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা একেবারে নগণ্য হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা এতদূর এগিয়ে গিয়েছে যে কর দেওয়া, মামলায় জুরির কাজ করা বা ভোট দেওয়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত

Scanned with CamScanner

বিরল ঘটনা ও সীমাবদ্ধ আবেদনের ক্ষেত্রেই মাত্র সাধারণ একজন ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সংশ্রব ঘটে। ভাববাদী প্রবণতা রাষ্ট্রকে একটি সর্ববিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব রূপে কল্পনা করে; রাষ্ট্র তাই আবশ্যিক ভাবে স্বেচ্ছা সংস্থাগুলির সঙ্গে আপাতঃ বহিঃসম্পর্ক সম্বন্ধে নির্বিকার যেহেতু এই সম্পর্কগুলি রাষ্ট্রের সর্ব-ধারক গঠনের মধ্যেই নিহিত। অতএব যে রাজনীতিক দর্শন রাষ্ট্রেতর সংস্থাগুলিকে স্বীকৃতি দেবার, রাষ্ট্রের উপরে তাদের প্রভাব নির্ণয়ের, উভয়ের পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্যে সমতা-সাধনের এবং উভয়ের জন্য স্বতন্ত্র কার্যবিধি প্রণয়নের চেষ্টা করে, ভাববাদী প্রবণতার চাইতে সমাজের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তা বেশি ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্পৃক্ত।

রাষ্ট্র সম্পর্কিত চরম কর্তৃত্ববাদী তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া দ্বিবিধ রূপ নেয়। হয় 'সাধারণ ইচ্ছা' ও 'প্রকৃত রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বে'র তত্ত্বকে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রেতর গোষ্ঠী ও ব্যক্তি-সংস্থার ক্ষেত্র পর্যন্ত তাকে সম্প্রসারিত করতে হবে; নতুবা 'সাধারণ ইচ্ছা' ও 'প্রকৃত ব্যক্তিত্ব'কে সরাসরি আধিবিদ্যক উৎভাবন হিসেবে বর্জন করতে হবে এবং রাষ্ট্রকে গণ্য করতে হবে একখণ্ড নিছক শাসনযন্ত্র রূপে, একদিন সম্মিলিত স্বেচ্ছাসংস্থাগুলির গোষ্ঠী যাকে বাতিল করে নিজেই তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

এই উভয়বিধ প্রতিক্রিয়ারই যে-রাষ্ট্রবিরুদ্ধ মনোভাব তা অধিকাংশ অন্যবিধ রাষ্ট্রতত্ত্বে বিবিধভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশে সেইসব তত্ত্বের আলোচনা করা হবে। মোটের উপরে গোষ্ঠীর প্রকৃত সত্তা ও ব্যক্তিত্বের উপরে জোর দেওয়াটাই সাম্প্রতিক প্রবণতা এবং এর পরের অধ্যায় এবং গিল্ড সোস্যালিজম্—বিষয়ক অধ্যায়ে স্বেচ্ছা গঠিত ঐ-সব গোষ্ঠীর উপরে রাষ্ট্রের ভাববাদ নির্দিষ্ট বিবিধ কার্যধারা আরোপের চেষ্টা করব।

———————